পঞ্চদশ অধ্যায়

পরিবেশ ও উন্নয়ন

[পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়টি গুর"ত্ব সহকারে সরকারের বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিবেচিত হচ্ছে। সরকার ইতোমধ্যে বেশ কিছু খাতওয়ারী নীতিমালা ও পরিকল্পনায় বিষয়টিকে সমন্বিত করছে। রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা, এদেশে দষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা এবং পানিসম্পদ রক্ষায় সমন্বিত নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত Millennium Development Goals (MDGs) এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে সপ্তম লক্ষ্য (টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরন) এর আওতায় নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে Second National Communication প্রস্তুত করছে যার আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন(adaptaion) ও প্রশমণ(mitigation) সহায়তার ক্ষেত্রে কী কী কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে এবং কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে তা নিরূপণ করা হবে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) ২০০৯ প্রণয়ন করেছে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। দেশে স্থাপিতব্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুসারে শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ দষণ সহনীয় মাত্রার মধ্যে থাকে তা নিশ্চিত হয়েই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জীব-বৈচিত্র্যের গুর" ত্ব অনুধাবন করে সরকার দেশের মূল্যবান জীবসম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২০ প্রণয়ন করেছে।]

বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

পরিবেশের উপর গুর"ত্বারোপ করার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত স্টকহোম কনফারেন্স (UN conferrence on the human environment) এর মাধ্যমে। এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান (Environmental Agencies) গঠিত হয় এবং অনেক দেশেই জাতীয় পরিবেশ কর্মপরিকল্পনা/নীতি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীকালে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের বিরূপ প্রভাব হ্রাস ও নিয়ন্ণের লক্ষ্যে বাসেল কনভেনশন, রটারডাম কনভেনশন ও স্টকহোম কনভেনশন গৃহীত হয়েছে এবং এর আওতায় নানা ধরণের কার্যক্রম বাস্বায়িত হচ্ছে। পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা ও বিশ্ববাসীকে জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণে জনমত সৃষ্টির জন্য ১৯৮৮ সালে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'Intergovernmental Panel on Climate Change' (IPCC)। আইপিসিসি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনের সুপারিশমালা বাস্বায়নে বিশ্ব সম্প্রদায় একজোট হয়ে কাজ করছে।

কিয়োটো প্রটোকল

পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আরেকটি পদক্ষেপ হচ্ছে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর আওতায় ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত কিয়োটা প্রটোকলের নেগোসিয়েশন। ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও গ্রীনহাউজ গ্যাস উদগীরণ কমানোর লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকল ১৬ ফেব্র"য়ারি ২০০৫ তারিখে কার্যকর হয়েছে। নভেম্বর ২০০৯ পর্যন্ বিশ্বের ১৮৭টি (ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ) দেশ কর্তৃক উক্ত প্রটোকল অনুসমর্থিত (ratified) হয়েছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ড় ১৩৭টি উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক কিয়োটো প্রটোকল অনুসমর্থিত হয়েছে। কাজাকিস্ড়ান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উক্ত প্রটোকল অনুসমর্থিত হয়নি। চীন এবং ভারত গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমণে উল্লেখযোগ্য ভমিকা রাখলেও তাদের ক্ষেত্রে ইইউ এর নির্গমণ মাত্রা প্রযোজ্য নয়। গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমণকারী বিশ্বের নির্বাচিত কয়েকটি দেশের তালিকা সারণি ১৫.১ এ দেখা যেতে পারে।

সারণি ১৫.১: বিশ্বের নির্বাচিত দেশসমহে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমণের বিবরণ

	দেশ	মোট নির্গমণ (CO2 মিলিয়ন মেট্রিক টন্স)	মাথাপিছু নির্গমণ (মাথাপিছু টন্স)
১.	চীন	৬৫৩৪	৪.৯১
২.	যুক্তরাষ্ট্র	৫৮৩৩	১৯.১৮
৩.	রাশিয়া	১৭২৯	১২.২৯
৪.	ভারত	১৪৯৫	১.৩১
৫.	জাপান	১২১৪	৯.৫৪
৬.	জার্মানী	৮২৯	১০.০৬
৭.	কানাডা	৫৭৪	১৭.২৭
৮.	যুক্তরাজ্য	৫৭২	৯.৩৮
৯.	দক্ষিণ কোরিয়া	৫৪২	১১.২১
১০.	ইরান	৫১১	৭.৭৬

উৎস: EIA (Environmental International Agency) এর ২০০৮ সালের তথ্য

আন্তর্জাতিক উদ্যোগসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'কোপেনহেগেন সমঝোতা'। গত ডিসেম্বর ২০০৯ এ ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনে ১৯৪টি দেশ, অসংখ্য পরিবেশবাদী সংগঠন এবং বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করে 'কোপেনহেগেন সমঝোতা' নামে এ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ সম্মেলনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে নামিয়ে আনার জন্য বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমণ কমিয়ে আনার নিমিত্ত একটি 'বাধ্যতামূলক আইনি চুক্তি' প্রণয়ন করার জন্য সমঝোতার সঙ্গে সুপারিশ করা হয়। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের নাজুকতা উপলব্ধি করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজন মেটাতে ২০২০ সাল পর্যন্ত উন্নত দেশগুলো যৌথভাবে প্রতিবছর ১ হাজার কোটি ডলার দেয়ার সুপারিশ করে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব রোধে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় তার ওপর গত ডিসেম্বরে ২০১০ কানকুনে অনুষ্ঠিত Conference of the Parties 16 (COP-16) এ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- অভিযোজন(adaptation) কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য Adaptation Committee প্রতিষ্ঠা
- যেসকল দেশে ১০ টিরও কম Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্প আছে এমন দেশগুলোকে সহায়তা এবং ঋণ প্রদান
- কানকুন সম্মেলনের অন্যতম সাফল্য হচ্ছে Green Climate Fund প্রতিষ্ঠা
- Annex Iভুক্ত উন্নত দেশসমূহ ২০১০-১১ মেয়াদে প্রতিশ্রুত ৩০ বিলিয়ন অর্থ উন্নয়নশীল দেশসমূহকে অভিযোজন এবং প্রশমন খাতে প্রদান
- উন্নত দেশ কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদে ২০২০ সাল হতে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সরবরাহ করা
- ৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটি Transitional Committee দ্বারা Green Climate Fund এর গঠন চূড়ান্ড় করা
- উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত ২৪ সদস্যের একটি বোর্ড দ্বারা উক্ত ফান্ড পরিচালিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ড়গ্রহণ
- একটি প্রযুক্তি নির্বাহী কমিটি ও একটি জলবায়ু প্রযুক্তি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে Technology Mechanism অর্থাৎ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলা ।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি

টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ (লক্ষ্য ৭) জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের (MDGs) মধ্যে অন্যতম । জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)-বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যৌথভাবে "Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2010" শীর্ষক প্রকাশিত প্রতিবেদনে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, ৭ নং এমডিজি এর আওতায় নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। দেশের নীতি এবং কার্যক্রমসমূহের টেকসই উন্নয়নের পদ্ধতিসমূহ সমন্বিত করার জন্য এমডিজি লক্ষ্য ৭ এর খ নং লক্ষ্যমাত্রায় বলা হয়েছে। টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ সংশিণ্টষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি নিম্নলিখিত সারণিতে দেয়া হল:

সারণি ১৫.২ঃ পরিবেশ সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের অগ্রগতি

উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং নির্দেশকসমূহ	ভিত্তি বৎসর ১৯৯১	বর্তমান অবস্থা	২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রা
লক্ষ্য ৭ খঃ জীববৈচিত্র্য ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ, ২০১০ এর মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাসকরণ			
৭.১ বনভূমি মোট ভূমির শতকরা অংশ (বৃক্ষের অংশ)	৯.০	১৯.২(২০০৭) বৃক্ষের ঘনত্ব>১০%	২০.০ বৃক্ষের ঘনত্ব>৭০%
৭.২ কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমণ (মাথাপিছু মেট্রিক টনস)	০.১৪	০.৩০	
৭.৩ ওজোন (ozone) হ্রাসকারক সিএফসি গ্রহণ (মেট্রিক টনস)	১৯৫	১২৭.৯০ (২০০৯)	০
৭.৪ মৎসের মজুদ নিরাপদ জীব ব্যাপ্তির শতকরা অংশে		৫৪ অভ্যন্তরীন ও ১৬ সামুদ্রিক	
৭.৫ মোট ব্যবহারকৃত পানি সম্পদ এর শতকরা হার		৬.৬ (২০০০)	
৭.৬ সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা পৃথিবীর (terrestrial) মোট সংরক্ষিত এলাকার শতকরা অংশে	১.৬৪	১.৭৮% terrestrial ও ০.৪৭ সামুদ্রিক	৫.০
৭.৭ বিলুপ্ত হওয়ার আশংকাযুক্ত জীবকুলের শতকরা অংশ		২০১ অভ্যন্তরীন ও ১৮ সামুদ্রিক	
৭.৮ উন্নত সুপেয় পানি ব্যবহারকারীদের শতকরা হার	৭৮	৮৬(২০০৯)	৮৯
৭.৯ স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট সুবিধা ব্যবহারকারীদের হার	৩৯.০	৫৪(২০০৯)	৭০
৭.১০. শহরাঞ্চলে বস্তিবাসীদের হার		৭.৮(২০০১)	

উৎস: ২০১০, UNDP বাংলাদেশ

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকুল প্রভাবগুলো কারণে বাংলাদেশের নাজুক পরিস্থিতি এখন সকল ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ঝুঁকিসমহ ও বিপন্নতা অভিযোজন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ব্যাপারে সমীক্ষা ও মূল্যায়নের ফলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাংলাদেশ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিপন্ন ও ঝুঁকির্পণ দেশগুলোর অন্যতম।

জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণার আন্তর্জাতিক সংস্থা 'Intergovernmental Panel on Climate Change' (IPCC) এর মতে, বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে আমাদের জলবায়ুর কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। উষ্ণতা আমাদের ঋতু পরিক্রমাতে প্রভাব ফেলছে এবং ঋতু বৈচিত্র্যের রূপকে করছে ক্ষুণ্ন। যার কারণে বিভিন্ন দুর্যোগ তথা অতি বৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় সিডর ও আইলা।

জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম বিরূপ ফল হচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। গত ১০০ বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ১০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার। জলবায়ু পরিবর্তনের বিপন্নতা ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীতে ৬৩.৪ কোটি মানুষ সমুদ্র উপকূলে বাস করে এবং পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ শহর উপকূল এলাকায় অবস্থিত। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বিপন্ন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বিপন্নতার ধরন ও মাত্রা বিভিন্ন স্থানে ও জনগোষ্ঠীতে বিভিন্ন রকম। বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাজুক অর্থনীতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিক নির্ভরশীলতা এ বিপন্নতা বাড়িয়ে দিয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে জলবায়ুর নিম্নবর্ণিত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে ঃ

- বাংলাদেশের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা গত ১৪ বছরে (১৯৮৫-১৯৯৮) মে মাসে ১ ডিগ্রী এবং নভেম্বর মাসে ০.৫ ডিগ্রী সেঃ বৃদ্ধি পেয়েছে
- গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের লোনা পানি দেশের অভ্যন্ড়রে প্রায় ১০০ কি. মি. পর্যন্ড় নদীতে প্রবেশ করছে
- বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত স্বল্প সময়ে বেশী বৃষ্টিপাত শহরাঞ্চলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করছে
- ভয়াবহ বন্যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বিগত ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৭ সালে
- বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বেড়েছে এবং প্রকোপতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অশান্ড় সমুদ্র জেলেদের জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশের উদ্যোগ

বাংলাদেশ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Kyoto Protocol স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ উক্ত কনভেনশনে ১৯৯২ সালে স্বাক্ষর এবং ১৯৯৪ সালে তা অনুসমর্থন করে। বাংলাদেশ অক্টোবর ২০০১ সালে কিয়োটো প্রটোকলে প্রবেশ লাভ করেছে। কিয়োটো প্রটোকলের অন্যতম গুরুত্বপর্ণ দিক Clean Development Mechanism (CDM), এর আওতায় উন্নত বিশ্বের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো নিজের দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রীন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাসের পরিবর্তে উন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে 'Certified Emission Reduction' (CER) ক্রেডিট নিজের খাতে জমা করতে পারবে। বাংলাদেশে CDM প্রকল্প অনুমোদনের জন্য দু'স্ড়র বিশিষ্ট Designated National Authority (DNA) গঠন করেছে। প্রথম স্তরে ৫ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় সিডিএম বোর্ড এবং দ্বিতীয় স্তরে ২২ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় সিডিএম কমিটি গঠন করা হয়েছে। জাতীয় সিডিএম কমিটি এ পর্যন্ড় মোট ৮ টি CDM প্রকল্প অনুমোদন করেছে। Infrastructure Development Co. Ltd. (IDCOL) বিশ্বব্যাংক, Global Environment Facility এর সহায়তায় জুন, ২০০৮ পর্যন্ত সারা দেশে ৫০ হাজার সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করেছে। অক্টোবর ২০০৯ পর্যন্ত এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪ লক্ষ ৩ হাজার টি। বিশ্বব্যাংক, কেএফডব্লিও, জিটিজেড, এডিবি, আইডিবি এবং বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় IDCOL কর্তৃক ২০১২ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

অভিযোজন ও প্রশমন

জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পূরণকল্পে প্রণীত National Adaptation Programme of Action (NAPA) ডকুমেন্টটির খসড়া ২০০৫ সালে প্রণয়ন করা হয়। ২০০৯ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় NAPA এর হালনাগাদ সংস্করণ প্রকাশ করেছে।

উলেণ্টখ্য, বাংলাদেশ UNFCCC এর আওতায় GEF-UNDP এর সহায়তায় বর্তমানে Second National Communication প্রস্তুত করছে। এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত adaptaion (অভিযোজন) ও mitigation (প্রশমণ) সহায়তার ক্ষেত্রে কী কী কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে এবং কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে তা নিরূপণ করা হবে। স্বল্পোন্নত দেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি ও বিরূপতা মোকাবেলায় ইউএনএফসিসি কর্তৃক এলডিসিএফ (Least Developed Countries Fund) এবং এসসিএফ (Special Climate Fund) নামে দুটি তহবিল রয়েছে। উক্ত এলডিসি ফান্ড হতে বাংলাদেশের NAPA সংশিণ্টষ্ট Community Based Adaptation to Climate Change Through Coastal Afforestation in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পটি বন অধিদপ্তর

বাস্ড়বায়ন করছে। উলেণ্টখ্য, ইউএনএফসিসিসি ইতোমধ্যে Adaptaion Fund গঠন করেছে। ৩২ সদস্য বিশিষ্ট Adaptaion Fund বোর্ডে স্বল্পোন্নত দেশের শ্রেণীতে বাংলাদেশকে বিকল্প সদস্য হিসেবে অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) ২০০৯ প্রণয়ন করেছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন ২০১০ প্রবর্তন করা হয়েছে। BCCSAP বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে Focal Point চিহ্নিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে Climate Change Cell স্থাপন করা হবে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সামগ্রিক কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য একটি Climate Change Unit স্থাপন করেছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরের জন্য অতিরিক্ত ৭০০ কোটি টাকা পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ৬ টি থিমেটিক এরিয়ায় বরাদ্দ করা হয়। থিমেটিক এরিয়াগুলো হচ্ছে ঃ-

১. খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা
২. সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
৩. অবকাঠামো
৪. তথ্য ও গবেষণা ব্যবস্থাপনা
৫. প্রশমন ও দূষণমুক্ত উন্নয়ন
৬. ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

উক্ত ৬ টি থিমেটিক এরিয়ার অধীনে চিহ্নিত মোট ৪৪ টি কর্মসূচির (প্রোগ্রাম) মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ

- জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জাত উদ্ভাবন, ফসল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত
- কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু ও স্বাস্থ্য খাতে জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন (adaptaion) সংক্রান্ড়
- জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ড়
- জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ড় মডেলিং, সমুদ্র-পৃষ্ঠের উচ্চতা, জীববৈচিত্র্য ও অর্থনৈতিক প্রভাব সংক্রান্ড়
- নবায়নযোগ্য (renewable) জ্বালানি, বনায়ন ও প্রশমন (mitigation) সংক্রান্ড়
- বাঁধ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও মেরামত সংক্রান্ড়
- বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ড়
- নদী খনন ও পুনর্খনন সংক্রান্ড়
- বন্যা, হঠাৎ বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের সাথে খাপ খাওয়ানোর বিষয় সংক্রান্ড় ইত্যাদি।

এসব সহ উপরোক্ত ৪৪ টি চিহ্নিত কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে তা ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহায়তা করবে। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এ পর্যন্ড় ৩৪ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে।

অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা থেকে উত্তরণের জন্য ২০১০-১১ অর্থবছরে বন বিভাগ কর্তৃক ১৯টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্ড়বায়ন করা হচ্ছে। জলবায়ু ট্রাস্টি বোর্ডের অর্থায়নে (১) জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সারাদেশব্যাপী ব্যাপক বনায়নের লক্ষ্যে চারা উত্তোলন (২) কেন্দ্রীয় অঞ্চলের কোর জোনে জলবায়ু পরিবর্তন স্থিতিস্থাপক বনায়ন (৩) উপকূলীয় এলাকায় পানি উন্নয়নে বোর্ডের বাঁধ ও বাঁধ সংলগ্ন চর এলাকায় বনায়ন (৪) Revegetation of Madhupur Forests through Rehabilitation of Forest Dependent Local and Ethnic Communities (৫) সুন্দরবনকে সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে ভোটদানে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ (৬) Forest Information Generation and Networking System এবং (৭) Reducing of Carbon Emmission through Establishment of Sonaichari Botanical Garden, Bhatiary, Chittagong শীর্ষক ৭টি প্রকল্প বাস্ড় বায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বনায়ন সংক্রান্ড় একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম

পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে সরকারের বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিবেচিত হচ্ছে। সরকার ইতোমধ্যে বেশকিছু খাতওয়ারি নীতিমালা ও পরিকল্পনায় বিষয়টিকে সমন্বিত করা শুরু করেছে। পরিবেশগত সমস্যাসমহ মোকাবেলায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ও এর সংস্থাসমূহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নে উপস্থাপন করা হ'ল।

পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকারের পরিবেশ নীতি ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্বায়ন করা হয়ে থাকে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১০-১১ অর্থবছরে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিম্নরূপ

- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতির আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা
- পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের আওতায় বিভাগ/জেলা পর্যায়ে ক্ষমতা অর্পণ
- পরিবেশ সংরক্ষণ আইনকে আরো যুগোপযোগী কার্যকর ও জনমুখী করা
- পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম ডিজিটাল সিষ্টেমের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ

এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তরের আরো কয়েকটি কার্যক্রম হল:

- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ সংশোধনের মাধ্যমে ছাড়পত্রসহ সকল প্রকার ফি এর হার বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ
- এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ও নিয়মিতভাবে ছাড়পত্র নবায়নে বাধ্য করা
- ২১ টি জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পকে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর আওতায় আনা
- পরিবেশ আইন ভঙ্গকারীদের বির“দ্ধে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য দেশের সর্বস্ড়রে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা
- প্রতিবেশগত ক্ষতির জন্য দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট ক্ষতিপূরণ আদায় করা

ওজোন স্ড়র রক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম

বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের ২ আগষ্ট মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর করে এবং প্রটোকলের লন্ডন, কোপেনহেগেন, মন্ট্রিল ও বেইজিং সংশোধনীসমূহ যথাক্রমে ১৯৯৪, ২০০০, ২০০১ ও ২০১০ সালে অনুমোদন করে। উক্ত প্রটোকল অনুযায়ী বাংলাদেশ ৫ নম্বর আর্টিকেল এর ১ নং অনুচ্ছেদে তালিকাভুক্ত দেশ। প্রটোকলের শর্তানুযায়ী, ওজোন ক্ষয়কারী সিএফসি-এর পর্যায়ক্রমিক নিয়ন্ত্রণ ১৯৯৯ সালের ১ জুলাই থেকে শুর“ হয়েছে এবং ২০১০ সালের ১ জানুযারি তা প্রায় শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হয়েছে।

গত ৩ বছরের ওজোন স্ড়র রক্ষায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- প্রতিবছর ওজোন স্ড়র ক্ষয়কারী দ্রব্যসমূহের আমদানি ও ব্যবহার সংক্রান্ড় তথ্যাদি সংগ্রহ ও ওজোন সচিবালয়ে তথ্য প্রেরণ।
- প্রতি বছর জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্ড়র্জাতিক ওজোন দিবস পালন
- ওজোন স্তর ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দ্রব্য আমদানির লাইসেন্স প্রদান
- ওজোন স্তর রক্ষায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা
- ওষুধ শিল্পে Metered Dose Inhaler (MDI) প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সিএফসি-১১ ও সিএফসি-১২ ফেজ আউট করার লক্ষ্যে UNEP ও UNDP-এর সহায়তায় এবং মাল্টিলেটারেল ফান্ডের অর্থায়নে Transition Strategy ও Conversion Project বাস্তবায়ন চলছে

- HCFC (Hydro-chlorofluorocarbon) ফেজ-আউট করার জন্য HCFC Phase-out Management Plan তৈরী করার কাজ শুরু হয়েছে

পরিবেশ সংরক্ষণে অংশীদারিত্বমলক কার্যক্রম

পরিবেশ সংরক্ষণে গণসম্পৃক্ততা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম শুরু করে যার আওতায় এ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিশু সংগঠন এবং বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাঁদের পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কার্যক্রমে বিভিন্ন রকম সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া, দেশে পরিবেশ সংবেদনশীল প্রজন্ম সৃষ্টির প্রত্যয় নিয়ে ইউনেস্কোর আর্থিক সহায়তায় Promotion of Environmental Awareness among School Children through Green Club শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ৬টি স্কুলে গ্রীন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত গ্রীন ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষকগণের মধ্য থেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে একজন করে সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর 'মিট দ্য পিপল' প্রোগ্রাম আয়োজন করে থাকে। 'মিট দ্য পিপল' প্রোগ্রাম পরিবেশ সংশিণ্টষ্ট অভিযোগ শুনানি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে জনসাধারণ ও সুধী সমাজের পরামর্শ গ্রহণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের জবাবদিহিতামূলক একটি কর্মসূচি। মিট দ্য পিপল প্রোগ্রামে যেকোনো ব্যক্তি বা উদ্যোক্তা পরিবেশ/পরিবেশ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট যে কোনো সমস্যা/অভিযোগ/পরামর্শ (ছাড়পত্র/পরিবেশ দূষণ) ইত্যাদি বিষয়ে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে মতবিনিময় করতে পারেন।

বাংলাদেশের নদ-নদীর পানি দূষণ

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত মনিটরিং ও গবেষণাগার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, দেশের অন্যান্য নদীসমূহের তুলনায় ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের পানি অধিকমাত্রায় দূষিত। The Dhaka Environmental Programme (Draft), ২০০৫ -এর cost benefit analysis -এ দেখা যায় যে, দূষণ নিয়ন্ত্রণে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা না হলে আগামী ২০ বছরে কমপক্ষে ৫১.১ বিলিয়ন টাকা অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে। শীতলক্ষ্যা নদীর পানির মান বর্ষাকালে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যে থাকে। তবে শুষ্ক মৌসুমে পানির মান নির্ধারিত মানমাত্রার নিচে নেমে যায়। বিশেষ করে ২০০৭ সালের পর পানির গুনাগুণ বেশ হ্রাস পেয়েছে। নদীর তীরে অধিক মাত্রায় স্যুয়ারেজ ও শিল্পবর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় নদীতে অপসারণ এবং নদীতে পানির প্রবাহ কমে যাওয়া এ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বালু নদীর পানির মানমাত্রা বর্ষা ও শুষ্ক মৌসুমে (pH ব্যতীত) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর মানমাত্রা বর্হিভূত এবং দূষণের মাত্রা ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। গৃহস্থালী, স্যুয়ারেজ ও অপরিশোধিত শিল্পবর্জ্য (তরলবর্জ্য ও কঠিন) সরাসরি নদীতে নির্গমণ করায় নদীর পানি দূষণের কারণ।

বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রন

বাংলাদেশ সরকার বায়ু দূষণ রোধকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর বায়ুর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে Clean Air Sustainable Environment (CASE) শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০৯-১৪ মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মূলত দুটি কম্পোনেন্ট ঃ

- পরিবেশ - এই কম্পোনেন্টে ইট ভাটার নিঃসরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এই কম্পোনেন্টটি পরিবেশ অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে এবং
- যানবাহন - এই কম্পোনেন্টের আওতায় যানবাহন ব্যবস্থাপনা এবং কারিগরি দিক অন্তর্ভুক্ত।

যানবাহন কম্পোনেন্টের বাস্তবায়নাকারী সংস্থা হচ্ছে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড। এ প্রকল্পের আওতায় উলেণ্টখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো-

- যানবাহন এবং ইট শিল্পে সাসটেইনেবল এনভায়রনমেন্টাল ইনিসিয়েটিভ (SEI) বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি,
- ইট শিল্প হতে নিঃসরণ মাত্রা হ্রাস,
- ঢাকার প্রকট যানজট নিরসন,

- বাংলাদেশ সরকারের ষ্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট পণ্ঢান (STP) এর আওতায় রাজধানী ঢাকাতে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (BRT) প্রচলন
- যানবাহন হতে নিঃসরণ হ্রাস।

জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির আর্থিক সহযোগিতায় 'এয়ার কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট থ্রু ক্লিন ফুয়েলস এন্ড ভেহিকেলস' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। UNEP এর Fourth Global Partnership Meeting for Clean Fuels and Vehicles শীর্ষক সভার সুপারিশ মোতাবেক সারা পৃথিবীব্যাপী যানবাহনের জ্বালানীতে সালফারের পরিমাণ হ্রাসসহ বায়ুদূষণমুক্ত জ্বালানি ও দূষণমুক্ত যানবাহন প্রযুক্তিসহ জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সময়ভিত্তিক রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় উন্নয়নশীল দেশের শহরগুলোর বায়ুরমান উন্নয়নের জন্য নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে Partnership For Clean Fuels and Vehicles (PCFV) কর্মসূচি গ্রহণ করে। মালে ঘোষণাপত্রের আওতায় PCFV বিষয়ে UNEP এর উপস্হাপনার পর উক্ত কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের বিষয়ে বাংলাদেশ আগ্রহ প্রকাশ করে। এ সমীক্ষা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে - ক) ডিজেল জ্বালানিতে অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপ হিসেবে সালফারের মাত্রা ৫০ পিপিএম-এ হ্রাস করার একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, খ) যানবাহন এবং যানবাহনের নিঃসরণ মাত্রা সুপারিশ করা, গ) একটি জাতীয় জ্বালানী অর্থনৈতিক নীতি সুপারিশ করা, ঘ) বায়ু-মানমাত্রা, ঙ সালফারযুক্ত জ্বালানি এবং দূষণমুক্ত যানবাহন স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপকারিতা সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে জনগণকে সংবেদনশীল করা। সংশোধিত বায়ুর মানমাত্রা প্রস্তুত ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ সালের তফসিল ২ এ বর্তমান বায়ু-মানমাত্রা সংশোধনপূর্বক প্রতিস্হাপন করা হয়েছে। ।

শিল্প দষণ নিয়ন্ণ

দেশে স্থাপিতব্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ দষণ সহনীয় মাত্রার মধ্যে থাকে তা নিশ্চিত হয়েই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। তীব্র দষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপন করার পরই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া ইত:পর্বে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমহে উপযুক্ত পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে চেম্বার এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টর-এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বৃহত্তর ঢাকা জেলায় শিল্প কারখানার সংখ্যা ও দষণের মাত্রা সঠিকভাবে পরিমাপ এবং দষণ নিয়ন্ণে কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বায়ু দষণ সংশ্লিষ্ট 'সার্ভে এন্ড ম্যাপিং অব এনভায়রনমেন্টাল পল্যুশন ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিজ ইন গ্রেটার ঢাকা এন্ড প্রিপারেশন অব স্ট্র্যাটেজিস ফর ইটস মিটিগেশন' শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রকল্প বাস্বায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিল্প-কারখানার সঠিক অবস্থান, ধরন, আকার, নির্গত বর্জ্যের বৈশিষ্ট্য এবং বিদ্যমান আইন মেনে কারখানাগুলো পরিচালিত হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

বন বিভাগ

বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বন সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়ে থাকে। দেশের বনভূমির সম্প্রসারণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত করাই বন অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য । বাংলাদেশে মোট ভূমির পরিমাণ ১৪.৭৫৭ মিলিয়ন হেক্টর হিসাবে মোট আয়তনের প্রায় শতকরা ১৭.০৮ ভাগ (২.৫২ মিলিয়ন হেক্টর) বনভূমি রয়েছে। তন্মধ্যে সরকারী বন ১.৫২ মিলিয়ন হেক্টর (১০.৩০ শতাংশ), অশ্রেণীভুক্ত বন ০.৩৭ মিলিয়ন হেক্টর (৪.৯৫%) এবং গ্রামীণ বন ০.২৭ মিলিয়ন হেক্টর (১.৮৩ শতাংশ)। সরকারি বন ১.৫২ মিলিয়ন হেক্টর বন অধিদপ্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পার্বত্য চট্রগামের অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন। বনায়ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কমায় এবং এর ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে।

দেশের বনজ সম্পদের ঘাটতি পূরণ, কাঠভিত্তিক শিল্প কারখানার কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং জনগণের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা জোরদার তথা সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর ইতোমধ্যেই বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, বন ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিগত উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, গ্রামীণ এলাকায় সরকারি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন

পতিত ও প্রান্তিক ভূমিতে জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ করে বনজ সম্পদ বৃদ্ধিকরণ ও কৃষি উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

২০১০-১১ অর্থবছরে বন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১৯ টি উন্নয়ন প্রকল্প (১৭ টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ২ টি কারিগরি) এর অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ৭৫৬৬.০০ লক্ষ টাকা। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে জুলাই ২০১০ হতে জানুয়ারী ২০১১ পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২৫৩৭.৪০ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৩৩.৫৪ শতাংশ । ২০১০-১১ আর্থিক সালে উলেণ্টখিত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তার মধ্যে বনায়ন কার্যক্রমই প্রধান। এ বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি বাগান সৃজন, সড়ক-রেলপথ-বাঁধ সংযোগ সড়ক বনায়ন, চর ভূমি বনায়ন, ঔষধি গাছের বাগান সৃজন, ইকো-পার্কের বিরল প্রজাতি, পশুখাদ্যের বাগানসহ সৃজন ভেষজ বাগান সৃজন , বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়নের জন্য বাগান সৃজন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বন অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি রাজস্ব বাজেটের আওতায় বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া ২০১০-১১ অর্থবছরে বন অধিদপ্তর কর্তৃক সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০৪ সংশোধন, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সৃজিত সামাজিক বনায়ন হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ অংশীদারদের মধ্যে বিতরণ, ট্রি ফার্মিং ফান্ড (Tree Farming Fund) গঠন করা হয়েছে।

সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বন অধিদপ্তরের একটি উলেণ্টখযোগ্য কার্যক্রম যা দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ১৯৮১ সাল হতে অদ্যাবধি এশিয়ান ব্যাংকের (এডিবি) আর্থিক সহায়তায় মোট চারটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্পের এবং কর্মসূচির আওতায় ১০,৯৫১ হেক্টর, ৫,৭৮২ কি.মি. স্ট্রীপ বাগান এবং ৩৩.১৮৫ লক্ষ চারা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বর্তমানে শীর্ষ সাতটি প্রকল্প:

- রীডল্যান্ড সামাজিক বনায়ন
- আগর বাগান সৃজন (১ম পর্যায়)
- চট্রগ্রাম উত্তর বন বিভাগ এলাকায় ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন (২য় পর্যায়)
- বৃহত্তর রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলায় বনায়নের মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দারিদ্র নিরসন
- পার্বত্য চট্রগ্রামের জনগণের অংশগ্রহণে সামাজিক বনায়ন ও বন সম্প্রসারণ
- বাঁশ, বেত ও মূর্তা বাগান সৃজন (২য় পর্যায়) ও
- সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

এছাড়া "বৃহত্তর সিলেট ও কক্সবাজার জেলার ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন(২য় পর্যায়)" শীর্ষক একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন আছে। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি সাফল্যজনকভাবে বন অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচিতে দরিদ্র এবং প্রান্তিক কৃষক অংশগ্রহণ করেছে এবং লভ্যাংশ বিতরণের ক্ষেত্রে সরকারের একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে সামাজিক বনায়নের আওতায় ২,১২৪ জন উপকারভোগীকে তাঁদের লভ্যাংশ বাবদ ৭ কোটি ৪৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। উলেণ্টখ্য, এ সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির সাথে ৫(পাঁচ) লক্ষ এর বেশী উপকারভোগী সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যেই নগদ ১৩২ কোটি ৬৮ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ৮৫,৯১০ দরিদ্র উপকারভোগীর মধ্যে হস্তান্তরের মাধ্যমে তাঁদেরকে স্বাবলম্বী করা হয়েছে।

জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ

জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের একটি অন্যতম উপাদান। বন নীতি ও পরিবেশ নীতিতে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণীর অভয়স্থল হিসেবে দেশে তিন শ্রেণীর সংরক্ষিত এলাকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া দেশের জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং ইকো-ট্যুরিজম, শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে ২৮টি সংরক্ষিত এলাকা সৃষ্টি করা হয়েছে। অধিকন্তু, কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্রসৈকত, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, সোনাদিয়া দ্বীপ, হাকালুকি হাওর, সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওর ও

মারজাত বাওর, গুলশান-বারিধারা লেক সুন্দরবন ও ঢাকা শহরের চতুর্দিকে প্রবাহমান ৪টি নদীসহ মোট ১২টি এলাকাকে ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের আওতায় বাংলাদেশ সরকার 'প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা' (Ecologically Critical Area-ECA) হিসেবে ঘোষণা করেছে। রামসার কনভেনশন অনুযায়ী জলাভমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য টাঙ্গুয়ার হাওরসহ বিভিন্ন হাওর ও জলাশয়ের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা ইতোমধ্যে নেয়া হয়েছে। সুন্দরবনের অংশবিশেষ (পর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ) এবং টাঙ্গুয়ার হাওর-কে রামসার এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৯৭ সনের ৬ ডিসেম্বর ইউনেসকো সুন্দরবনকে 'বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান' (World Heritage Site) হিসেবে ঘোষণা করে।

প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার দেশের মূল্যবান জীবসম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২০ প্রণয়ন করেছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। National Biosafety Framework বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "ইমপিণ্ডমেন্টেশন অব ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় বিদ্যমান পাহাড়সমূহের গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিবেচনায় এনে বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত পাহাড়সমূহ অবৈধভাবে কর্তন রোধকল্পে সরকার ২০১০ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ সংশোধন করেছে। পরিবেশ ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করা হচ্ছে। ফলে অবৈধভাবে পাহাড় কাটার প্রবণতা কমে আসছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটিস (GEF) এবং UNDP-এর অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন 'কোস্টাল এন্ড ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট এ্যাট কক্সবাজার এন্ড হাকালুকি হাওর' (CWBMP) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার-টেকনাফ পেনিনসুলা, সোনাদিয়া দ্বীপ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ এবং হাকালুকি হাওরের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ইসিএ সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। সাধারণ ও দরিদ্র জনগণকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনার লক্ষ্যে ৭২টি গ্রাম সংরক্ষণ দল(ভিসিজি) গঠন করা হয়েছে। এলাকার দরিদ্র জনগণের বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টিতে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি ভিসিজি দলকে ১লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র মূলধন অনুদান প্রদান করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকল্পে সমাজভিত্তিক নার্সারী, সামুদ্রিক কচ্ছপের এর নিরাপদ বংশ বৃদ্ধির জন্য হ্যাচারী, উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ ও হাওড় এলাকায় হিজল-করচ বনায়ন, বনজ ও ঔষধী উদ্ভিদের চারা রোপন, পরিবেশ বান্ধব কৃষি ও উদ্যান সম্প্রসারণ এবং মৎস্য ও বন্যপ্রাণীর জন্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া পাখী শিকার, ক্ষতিকর জালের ব্যবহার ও শামুক-ঝিনুক-প্রবাল আহরণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বন অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ বিশেষ প্রকল্প এবং কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে । যেমনঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর অধিকতর উন্নয়ন, চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলা ও চুনতি অভয়ারণ্যে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ধানসিঁড়ি ইকো-পার্ক স্থাপন ও রামসাগর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন, বৃহত্তর সিলেট জেলার টিলাগড় ও বড়শীজোড়ায় ইকো-পার্ক স্থাপন প্রকল্প, চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের খুরুশিয়া রেঞ্জের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ পর্যটন কর্মসূচি, কোটবাড়ীস্থ লালমাই মৌজায় জীব-বৈচিত্র্য সমৃদ্ধিকরণ ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি কর্মসূচি, টেংরাগিরি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ইকো-ট্যুরিজম সুযোগ বৃদ্ধি কর্মসূচি এবং পিরোজপুর রিভারভিউ ইকো-পার্ক স্থাপন কর্মসূচি।

অবশিষ্ট প্রাকৃতিক বনকে আগামী প্রজন্মের জন্য রক্ষা করা এবং অবশিষ্ট বিদ্যমান জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য একটি টেকসই মডেল উদ্ভাবন করার জন্য ইউএসএইড এর অর্থায়নে ২০০৪-০৫ হইতে ২০০৮-০৯ পর্যন্ত নিসর্গ সহায়তা শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক বন রক্ষায় জনগণকে সাথে নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে বর্ণিত প্রকল্পে সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল ৫টি বনাঞ্চলে (মৌলভীবাজারের লাউয়াছড়া, হবিগঞ্জের রেমা কালেংগা ও সাতছড়ি, চট্টগ্রামের চুনতি ও কক্সবাজারের টেকনাফ) চালু করা হয়েছিল এবং একটি অঞ্চলে (মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক, টাঙ্গাইল) সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। পরীক্ষমূলকভাবে বাস্তবায়িত সহব্যবস্থাপনা মডেল এর সফলতার উপর নির্ভর করে বর্তমানে ইউএসএইড এর অর্থায়নে ইনটিগ্রেটেড প্রটেকটেড এরিয়া কো-

ম্যানেজমেন্ট (আইপ্যাক) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১৯টি সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

বরেন্দ্র এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়নকল্পে বনায়ন প্রকল্প

বরেন্দ্র অঞ্চল অন্যান্য অঞ্চল হতে ভিন্ন প্রকৃতির। বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২২.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে "বরেন্দ্র এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়নকল্পে বনায়ন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্প (মেয়াদ জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১১ পর্যন্ত) বাস্তবায়ন শেষে বরেন্দ্র এলাকায় ফলের চাহিদা পূরণসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

দেশের উদ্ভিদ সম্পদের উপর ট্যাক্সোনমিক গবেষণা বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম সম্পাদন করে থাকে। এটি একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হল ফিল্ড সার্ভের মাধ্যমে কৃষিজ, বনজ, ভেষজ, ক্ষয়িষ্ণু ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদসহ সকল প্রকার বৃক্ষলতা প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ, সনাক্তকরণ, সংরক্ষণ করা ও সংগৃহীত উদ্ভিদ সম্পদের ডাটাবেজ প্রস্তুত করা। হারবেরিয়াম কর্তৃক দেশের উদ্ভিদ সম্পদের তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা "ফ্লোরা অব বাংলাদেশ" সিরিজ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। দেশের ভেষজ সম্পদ, উদ্ভিদ বিদ্যার চর্চা এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উলেণ্টখযোগ্য বৃক্ষসম্পদের গবেষণা ও উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে হারবেরিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচর্যাকৃত তথ্যসমৃদ্ধ এসকল উদ্ভিদ নমুনা জাতীয় সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত থাকে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ২০১০-১১ অর্থবছরে উদ্ভিদ সমীক্ষা কার্যক্রম (Botanical Survey Activities), উদ্ভিদ সনাক্তকরণ (Plant Identification), সনাক্তকরণকৃত উদ্ভিদের ডাটাবেজ তৈরীকরণ, উদ্ভিদ সংরক্ষণ (Plant preservation), Flora of Bangladesh প্রকাশনা কার্যক্রম , ফ্লোরিস্টিক প্রকাশনা (Floristic Publication), উদ্ভিদ প্রজাতিকে বাংলাদেশের জন্য নতুনভাবে নথিভুক্তকরণ (New Record) ইত্যাদি কার্যাবলী বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, জিওবি'র আর্থিক সহায়তায় "রেড ডাটা বুক অব ভাসকুলার পণ্টান্টস অব বাংলাদেশ, ভলিউম-২" শীর্ষক কর্মসূচি জিওবি'র আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়ন করছে। ২০১০-১১ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়ে কর্মসূচিটির বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৩৬ শতাংশ।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিএফআরআই)

দেশের বন ও বনজ সম্পদ বিষয়ক গবেষণার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বি.এফ.আর.আই.) একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিজ্ঞানসম্মত সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে বনজ সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন, সংরক্ষণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ পরিবেশের উন্নয়ন বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা এর প্রধান লক্ষ্য। এ প্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (বি.এফ.আই.ডি.সি), পলণ্টী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বৃক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সংশিণ্টষ্ট এনজিও, ব্যক্তি উদ্যোক্তাসহ জনসাধারন এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে বন ও বনজ সম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা সহায়তা ও অন্যান্য সেবা প্রদান করে আসছে। দেশের বনজ সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও সরবরাহে ভারসাম্যহীনতা হ্রাসের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা কার্যক্রমের পাশাপাশি আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

স্বউদ্যোগে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও বনজ সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়াসে প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ হতে নিম্নলিখিত কয়েকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রযুক্তির কারিগরি সহায়তার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে ঃ

- কঞ্চি কলম ও টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে ব্যাপক বাঁশ চাষ
- রাসায়নিক সংরক্ষণী প্রয়োগে গ্রামীন বসতবাড়ির নির্মাণসামগ্রী এবং পান বরজে ব্যবহৃত বাঁশ সামগ্রী ও বাঁশ-বেতের আয়ুষ্কাল বর্ধন
- নার্সারী বন বাগানে পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
- নার্সারী ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রজাতির চারার সার প্রয়োগের পরিমান নির্ধারণ

- জ্বালানী কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কপিস ব্যবস্থাপনা ও এর আবর্তনকাল পদ্ধতি
- গুরুত্বপূর্ণ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির নার্সারী ও বাগান উত্তোলন কৌশল
- স্বল্পমূল্যে পার্টিকেল বোর্ড তৈরীর কৌশল এবং
- স্বল্পখরচে ও স্বল্পশ্রমে বৃক্ষ চারা রোপনে সহজ পদ্ধতি।

ইতোপূর্বে সম্প্রসারিত প্রযুক্তিসমূহের মধ্যে "পান বরজের বাঁশ সামগ্রীতে প্রয়োগকৃত রাসায়নিক সংরক্ষণী" মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত প্রযুক্তির অর্থনৈতিক বাস্তব প্রভাব মূল্যায়ন নিরূপনের লক্ষ্যে সমীক্ষা পরিচালনার জন্য (৩টি এলাকা) বরিশালের গৌরনদী, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর ও গাইবান্ধার পলাশবাড়ি উপজেলা নির্বাচন করা হয়। বরিশাল ও কুষ্টিয়ায় পরিচালিত সমীক্ষার বিশেণ্ঢষন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়। পানবরজ খামারের অবকাঠামো নির্মাণ খরচের মধ্যে মূলধনের বেশীর ভাগ বাঁশসামগ্রী খাতে যোগান দিতে হয়। প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বাঁশসম্পদ সাশ্রয়ের পরিমান উলেণ্ঢখিত দুটি এলাকায় যথাক্রমে শতকরা ৬২.৫ ভাগ ও ৬৫ ভাগ এবং পান উৎপাদনের গড় খরচ হ্রাস পাওয়ায় সংশিণ্ঢষ্ট কৃষিজীবি ও ভোক্তা শ্রেণী উভয়েই লাভবান হয় ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া, আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষত সাইক্লোন, খরা, ঝড় ইত্যাদির পর্বাভাস, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) আবহাওয়া সংক্রান্ স্যাটেলাইট তথ্যাদি এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের 'বন্যা পর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র' বন্যা পর্বাভাস প্রদান করে থাকে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO), আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত।

ভমিকম্পসহ অন্যান্য যে কোন বড় ধরনের দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলা ও উদ্ধার কাজ ত্বরান্বিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ব্যাপক প্রচারণা কর্মসচি গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগ প্রশমনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ দাতা সংস্থাসমূহের সহায়তায় 'কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি)' শীর্ষক ২য় পর্যায়ের প্রকল্পটি ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১০-১৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। নীতি সংস্কার ও পেশাগত উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়ন, ভূমিকম্প ও সুনামী প্রস্তুতি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং তথ্য যোগাযোগের উন্নয়ন ইত্যাদি আলোকপাত করে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হচ্ছে।

সিডিএমপি প্রকল্পের আওতায় ২০১০-২০১৪ সালে বাস্তবায়নের জন্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরুপ:

- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ২০০০ ইউনিয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
- ১২টি প্রধান মন্ত্রণালয়কে তাদের পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস নীতি অর্ন্তভূক্ত করতে সহায়তা করা
- ৭টি বিভাগে ৭টি পরীক্ষামূলক দুর্যোগ সহনশীল গুচ্ছ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা
- কাঠামো ও অ-কাঠামোগত উদ্যোগের মাধ্যমে ১ কোটি বিপদাপন্ন মানুষকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তা করা
- ভূমিকম্পের ঝুঁকি ও ৮টি প্রধান শহরের জন্য ওয়ার্ডভিত্তিক ভূমিকম্প কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা তৈরি
- জনগোষ্ঠীর (কমিউনিটি) ঝুঁকি নির্দেশক ও প্রস্তুতি অর্ন্তভূক্ত করে জাতীয় সতর্কীকরণ পদ্ধতি তৈরী করা
- অন্তত: ৩টি জেলায় নদী ভাঙ্গন ও জলবায়ু পরিবর্তন- এ ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সেফটি-নেট কার্যক্রম শুরু করতে সহায়তা করা
- মুঠোফোন ভিত্তিক আগাম সতর্কীকরণ পদ্ধতির প্রসার ঘটানো।

দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকরণে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর সংশোধিত সংস্করণ এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ শীর্ষক ২টি দলিল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৬ শতাধিক সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন প্রকল্পসহ মোট ৭১২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ৫৯ লক্ষ হেক্টর জমি বন্যামুক্ত করেছে এবং সেচের আওতায় এনে শস্য উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় উপকূল ও নদীতীরে নির্মিত ১০ হাজার কিলোমিটারের অধিক বাঁধ, প্রায় ৮ কোটি মানুষ ও ১.৫০ কোটি ঘরবাড়িসহ দেশের বিস্তীর্ণ এলাকাকে বন্যা ও লবণাক্ততা হতে রক্ষা করছে। এ ছাড়াও নদীভাঙ্গন রোধকল্পে ৫৬১ কিলোমিটার রিভেটমেন্ট, ২২০টি স্পার ও গ্রোয়েন নির্মাণ করে ৪০০টি গুরুত্বপূর্ণ শহর বন্দর, শিল্প কারখানা, স্থাপনা, জমি ও ঘরবাড়িসহ প্রায় ৪৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ নদীভাঙ্গন হতে রক্ষা করা হয়েছে। এ যাবৎ ১ লক্ষ হেক্টর জমি সমুদ্র হতে উদ্ধার করে বনায়ন, কৃষি ও বসতি স্থাপনের আওতায় আনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো জমি উদ্ধারের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। পানি সম্পদ নীতি ১৯৯৯ অনুসারে পানি সম্পদ খাতের কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যাদি সম্পাদন করা হচ্ছে।

পানি সম্পদ খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার এ খাতে উত্তরোত্তর বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে। গত ২০০৯-১০ অর্থ বছরের এডিপিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ছিল ১৩৬২.১৮ লক্ষ টাকা। ২০১০-১১ অর্থবছরে উক্ত বরাদ্দ ১৫১১.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয় যা গত বছরের এডিপি অপেক্ষা ১১ শতাংশ বেশি।

২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ

- ক্যাপিটাল ড্রেজিং
- গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়ে)
- যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রজেক্ট
- পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প
- জরুরি দুর্যোগ ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন (সেক্টর) প্রকল্প
- সেকেন্ডারি টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন (ফেস-২) প্রজেক্ট
- Emergency Cyclone Recovery and Restoration Project 2007 (ECRRRP)
- ঘূর্ণিঝড় আইলায় উপকূলীয় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কৌশলগত ৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনায় সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা দ্বারা দেশের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠির সেবাসহ সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠির সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এছাড়া, এর অন্যতম সংস্থা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর ভিশন হচ্ছে জাতীয় পানি নীতি, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, বাপাউবো আইন ২০০০ এবং অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশাবলীর আলোকে প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে পানি সেক্টরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সেবা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো প্রণীত হয়েছে এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলতি ২০১০-১১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ৩৬ টি প্রকল্প (১৯টি বিনিয়োগ ও ১৭ টি কারিগরি প্রকল্প) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে এসব প্রকল্পের অনুকুলে মোট ২১২.৮৬ কোটি টাকা (জিওবি ৭০.৮৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৪১.৯৮ কোটি টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারী ২০১১ পর্যন্ত এসব প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ৫৩.৪৯ কোটি টাকা। সার্বিক অগ্রগতি প্রায় ২৫.১৩ শতাংশ। এছাড়া চলতি অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩ টি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। চলতি অর্থবছরে কর্মসূচীগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত ২০.৫৩ কোটি টাকার মধ্যে ফেব্রুয়ারী ২০১১ পর্যন্ত ৩.০৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

পরিবেশ ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিবেশ ও বন ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ সার্বিকভাবে দেশের পরিবেশ উন্নয়নে অপরিসীম অবদান রাখছে। দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট এসকল প্রকল্প, কার্যক্রম ও কর্মসচি ছাড়াও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের

আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমহ পরিবেশ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। কৃষি মন্ণালয় কৃষি জমিতে উন্নত ও জৈব সার ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করছে, যা ইউরিয়া সারের সাশ্রয়সহ পরিবেশের দষণ রোধে ভমিকা রাখছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে এনজিও

দেশের পরিবেশ সমস্যা মোকাবেলা এবং পরিবেশ ব্যবস্থা উন্নয়নে আশি'র দশক থেকে সরকারের পাশাপাশি আন্ড়র্জাতিক সংস্থা ও বেসরকারি সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে তৃণমল পর্যায়ে জনগণকে পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে সংগঠিত করার ব্যাপারে এনজিওসমহ গুর"ত্বপর্ণ ভমিকা রাখছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হ'ল, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দি কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন), সেন্টার ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (সিএসডি), বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ (বিসিএএস), এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন ম্যানেজম্যান্ট সেন্টার, ওয়েস্ট কনসার্ন, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি (বেলা) ইত্যাদি।